সম্পূর্ণ উপন্যাস

অন্তর্ধান রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
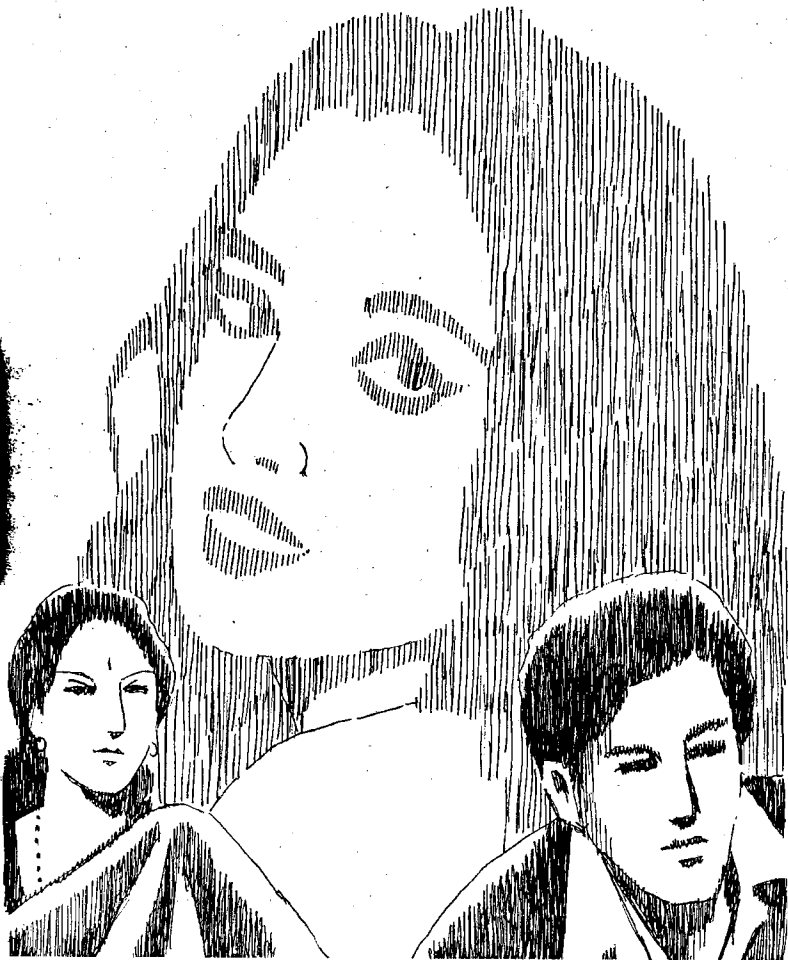
আমি পড়েছি মহা মুশকিলে। তিন্নিদিকে আমি কিছুতেই মিথ্যেবাদী হিসেবে ভাবতে পারি না। তিন্নিদির নাম শোভনা মজুমদার, একটা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল। তাঁকে যারা চেনে, তাঁকে যারা কাছ থেকে দেখেছে, তারা সবাই জানে যে বানিয়ে বানিয়ে একটা মিথ্যে গল্প বলা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! তাঁর হাসিতে যে সারল্য থাকে তা দেখলেই বোঝা যায় যে এই রকম মানুষের হৃদয়ও একেবারে স্বচ্ছ। অনেক সময় তিনি দু'একটা অপ্রিয় সত্যও বলে ফেলেন। যা না বলাই উচিত।

আবার তিন্নিদির কথাটা বিশ্বাস করা কিংবা মেনে নেওয়াও আমার পক্ষে খুবই শক্ত। তা হলে আমার জীবনের অনেক বিশ্বাস আর যুক্তিবোধও বিসর্জন দিতে হয়।

মূল ঘটনাটা ঘটেছিল সাড়ে চার মাস আগে।

তখন অনেক খবরের কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল। অনেকের হয়তো মনে আছে। অবশ্য অনেকে বলে যে পাবলিকের স্মৃতিশক্তি খুব স্বল্পস্থায়ী। খবরের কাগজে পরপর অনেক কিছুই তো ঘটতে থাকে। জনসাধারণও আগেরগুলো ভুলতে শুরু করে।

রিংকু আর তিন্নিদিরা দুই বোন। একেবারে পিঠোপিঠি। রিংকুই ছোট। দিদির সঙ্গে তার বয়েসের ব্যবধান মাত্র দেড় বছর। দু'জনের চেহারায় অবশ্য মিল নেই। তিন্নিদি রোগা, ছিপছিপে, আর রিংকুর শরীরটা একটু ভারির দিকে, ফর্সা রং। রোগা হলে রিংকুকে যেন ঠিক মানাতো না। একবার আমার বন্ধু জহর আমাকে বলেছিল, আমাদের কলেজে প্রিন্সিপালের ঘরে যে একটা সরস্বতী মূর্তি আছে, তার মুখটা ভালো ভাবে লক্ষ করে দেখেছিস, ঠিক যেন হুবহু রিংকুর মতন। আমি অবশ্য সেই মিলটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে রিংকুর চেহারায় একটা দেবী দেবী ভাব আছে, তাও ঠিক।

ওরা দু'বোনই পড়াশুনোয় খুব ভালো।

তিন্নিদি প্রথম থেকেই কলেজে পড়াবার কাজ পেয়ে যায়। রিংকুও সে রকম কাজ পেয়ে যেত অনায়াসে, কিন্তু সে সবাইকে বলে দিয়েছিল যে সে স্কুল-কলেজে পড়াবার কাজ কিছুতেই নেবে না। সে এমন কোনো চাকরি পেতে চায়, যাতে দেশ-বিদেশে বেড়াবার সুযোগ থাকবে।

ওদের কোনো ভাই বা দাদা নেই। মা চলে গেছেন বছর চারেক আগে।

বাবার বয়েস এখন চুয়াত্তর, যদিও তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায় না। স্বাস্থ্য এখনও অটুট, সোজা হয়ে হাঁটেন। এক সময় আর্মিতে কাজ করতেন, তার চিহ্ন হিসেবে রয়েছে পুরুষ্টু গোঁফ, গলার আওয়াজও জোরালো, কিন্তু বদমেজাজি নয়। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের খুব ভালো-বাসেন। তিনি অনেকটাই স্বাবলম্বী, নিজের জামা-কাপড় নিজেই কাচেন। একবার ওদের কাজের লোক তাঁর জুতো পালিশ করে দিচ্ছিল, তিনি দেখতে পেয়ে খুব বকুনি দিয়েছিলেন তাকে। তিনি বলেছিলেন, যে-লোক নিজের জুতো পালিশ করতে জানে না, তার জুতো পরাই উচিত নয়।

তাঁর নাম অশেষ চৌধুরী, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তাঁকে গুরুদা বলে ডাকে। কী করে অশেষ চৌধুরী গুরুদা হয়ে গেলেন, তা অবশ্য আমি জানি না।

ভবানীপুর অঞ্চলে অনেকেই তাঁকে চেনে। তাঁদের দোতলা-বাড়িটা পুরোনো আমলের, মাঝখানে একটা উঠোন আছে। একতলায় একটা বসবার ঘর, অন্য দুটি ঘর প্রায় ব্যবহারই হয় না।

বড় রাস্তার ওপরে এরকম বাড়ি এযুগে প্রায় দেখাই যায় না। অনেক প্রমোটার সেই বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি করার জন্য অনেক ধরাধরি করেছে, অশেষ চৌধুরী কিছুতেই তাতে রাজি নন।

রিটায়ার করার পর তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বাড়িতে বসে থাকেননি, পাড়ার একটা স্কুলের সঙ্গে তিনি অনেকটাই যুক্ত। স্কুলটা অবশ্য করপোরেশানের, গুরুদা সেখানে পড়ান না, তিনি হেড মাস্টারও নন, তবু তিনি প্রত্যেকদিন সেই স্কুলে সারাক্ষণ বসে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি প্রত্যেকটি ঘরে উঁকি মেরে দেখে আসেন, সেখানে ঠিক মতন পড়াশুনো হচ্ছে কিনা তা বুঝে নেন। কোনো মাস্টারমশাই যদি ফাঁকি মারেন, তাহলে তক্ষুনি তাঁকে কিছু বলেন না, সন্ধেবেলার দিকে গুরুদা তাঁর বাড়িতে চলে যান। সেখানে কী কথা হয় কে জানে। কোনো দুরন্ত বা অবাধ্য ছাত্রের বাড়িতেও যান তিনি।

যদিও কোনো পদাধিকার নেই, তবু পাড়ার লোক সেই বীণাপাণি বিদ্যালয়কে বলে গুরুদার ইস্কুল। তিনিই যেন স্কুলটার অভিভাবক। নিজের টাকা-পয়সাও খরচ করেন স্কুলটার জন্য। একবার স্কুলের কলের জল খেয়ে সতেরো-আঠেরোজন ছাত্রের সাংঘাতিক পেটের গোলমাল হলো, তিনজনকে পাঠাতে হয়েছিল হাসপাতালে। গুরুদা এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলের কমপাউন্ডে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিলেন। নিজের খরচে।

ওঁর পুত্রসন্তান নেই, শুধু দুটি মেয়ে। তারা বড় হয়েছে, লেখাপড়াতেও প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। এখন তো তাদের চলে যাবার পালা।

আমার সঙ্গে ও বাড়ির সম্পর্ক মাত্র বছর তিনেকের। তাও একটা ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্রে। আমার ছোটকাকার বিয়ের সময় নেমন্তন্ন করার জন্য যে তালিকাটা তৈরি হয়েছিল, তার মধ্যে নাম ছিল অশেষ চৌধুরীর। সে নাম আমার অচেনা।

বাবা বলেছিলেন অশেষ তাঁর এক মামাতো ভাই। একসময় দুই পরিবারের বেশ যোগাযোগ ছিল, আমার মায়ের মৃত্যুর পর সেটা আস্তে আস্তে কমে যায়। উনি যখন দিল্লিতে থাকতেন, তখন আমার ছোটকাকা প্রায় মাসখানেক ওঁর বাড়িতে থেকে এসেছেন। সুতরাং এ বিয়েতে ওদের ডাকতেই হয়। আমার ওপর ভার পড়েছিল, নেমন্তন্নর কার্ড নিয়ে ওঁদের বাড়ি যাওয়ার।

অন্য কথা পরে হবে। ও বাড়িতে শনি-রবিবার বিকেলে বেশ বড় আড্ডা বসে। আমিও ভিড়ে গেলাম সেখানে। তখনই আমি জেনেছিলাম যে, তিন্নিদি কখনো বিয়ে করবেন না বলে পণ

করেছেন। বিয়ে বিষয়ে কোনো আলোচনাও শুনতে চান না।

আমি আর আমার মতো আর কয়েকজন ধরেই নিয়েছিলাম, তিন্নিদি তাঁর বাবাকে এত ভালোবাসেন যে তাঁর জন্যই এরকম আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেছেন। বিয়ে করলেই তাঁকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। অথবা তাঁর স্বামীকে থাকতে হবে এ বাড়িতে। এখন ঘর-জামাইদের সকলেই কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখে।

রিংকু কী করবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। বিয়ে করুক বা না করুক, সে হঠাৎ বিদেশে চলে যেতে পারে। কিংবা চাকরি পেয়ে চলে গেল হায়দ্রাবাদ কিংবা বাঙ্গালোর।

বিয়ে না করলেও তো প্রেম করা যায়।

যে বাড়িতে দু'দুটি যুবতী মেয়ে রয়েছে, যারা গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের মতন অসাধারণ রূপসী না হলেও দেখতে বেশ ভালোই বলা যায়, সে বাড়িতে কিছু কিছু যুবকদের আসা-যাওয়া শুরু হওয়াও স্বাভাবিক। অশেষ চৌধুরীও এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। মাঝে মাঝে তিনিও এসে সেই আড্ডায় যোগ দেন।

এর মধ্যে একদিন রিংকু একটা ইন্টারভিউয়ের চিঠি পেল, দিল্লি থেকে।

রিংকু কখন, কোথায় চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠায়, তা আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু এই চিঠিটা নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল এক রবিবার পুরো সকালবেলার আড্ডায়।

চিঠিটা এসেছে ক্যানাডার দূতাবাস থেকে। তাঁরা চেয়েছেন যোগ্যতা হিসেবে অর্থনীতিতে এম এ ডিগ্রি, পৃথিবীর যে-কোনো দেশে পোস্টিং হতে পারে, বিবাহিত হলেও চলবে, কিন্তু সন্তান থাকলে আবেদন করার দরকার নেই, ক্যানাডায় কোনো নিকট আত্মীয় থাকলেও চলবে না। আরও এরকম দু'একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারের সঙ্গে বলা হয়েছে বাংলা ও ফরাসি ভাষায় দক্ষতা থাকা দরকার। সব কটি শর্তই রিংকুর সঙ্গে মিলে গেছে, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারে সে পুরো

দিদি তুই খাবার কিছু এনেছিস?

দু'বছর ফরাসি ভাষা শিক্ষার ক্লাস করেছে। কিন্তু ক্যানাডিয়ান এমব্যাসির চাকরিতে বাংলা জানতে হবে কেন? ক্যানাডার জনসংখ্যার বিশাল একটি অংশ ফরাসি-ভাষী, তাই ঐ ভাষা জানার কারণটা বোঝা যায়, কিন্তু বাংলা?

এ চাকরিতে রিংকুর বাবার কোনো আপত্তি নেই। তিনি মেয়েদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চান না। তিন্নিদির ঘোর আপত্তি, পৃথিবীর যে-কোনো দেশে পোস্টিংয়ের শর্তটির জন্য। যদি আফ্রিকার কোনো দেশে পাঠিয়ে দেয়? আর ঐ শর্তটিও রিংকুর কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়।

যাই হোক, ইন্টারভিউয়ের চিঠি পাওয়া আর চাকরি পেয়ে যাওয়া তো এক নয়। রিংকুকে আগে দিল্লি যেতে হবে। কার সঙ্গে যাবে?

এ কথাটা শুনেই রিংকু তেলে বেগুনের মতন চিড়মিড়িয়ে উঠলো। কার সঙ্গে মানে? এখন মেয়েরা একা একা সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর দিল্লি পর্যন্ত সে একা যেতে পারবে না? সে কিছুতেই কোনো সঙ্গী চায় না।

গুরুদা বলেছিলেন, তিনি অনেকদিন দিল্লি যাননি, এই সুযোগে একবার ঘুরে আসতে পারেন।

রিংকু তাঁকে বললো, বাবা, ইন্টারভিউতে যদি জিজ্ঞেস করে, কলকাতা থেকে কেউ কি তোমাকে পৌঁছে দিতে এসেছে? আমি যদি বলি, আমার বাবা এসেছেন, তা হলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাতিল করে দিতে পারে। তারা ধরেই নেবে যে আমি স্বাবলম্বী নই।

আরও তিন-চারজন রিংকুর সঙ্গে যেতে রাজি ছিল, রিংকু তাদের পাত্তাই দিল না। এমনকি আমার নামও কেউ একজন প্রস্তাব করেছিল, রিংকু তাও হেসে উড়িয়ে দিল।

সে বললো, এই নিলচেটা এমন ভুলোমনা, আমাকেই ওর দেখাশুনো করতে হবে। তা ছাড়া দিল্লিতে আমার থাকার জন্য হোটেল বুক করা আছে। ও তো সেখানে থাকতে পারবে না।

রিংকু আর আমি সমবয়েসি। অন্যরা আমাকে নীলাঞ্জন বলে ডাকলেও রিংকু ডাকে নিলচে।

রিংকুর ঐ কথার প্রতিবাদ জানিয়ে আমাকে কিছু বলতেই হয়।

আমি বলেছিলাম, দিল্লিতে আমার অনেক বন্ধু আছে, থাকার জায়গার

কোনো অভাব নেই। ট্রেনে একা একা যাওয়ার চেয়ে দু'জনে গল্প করতে করতে গেলে বেশ ভালোই লাগবে। দিল্লিতে নেমে যে-যার আলাদা হয়ে যাবো।

রিংকু জিজ্ঞেস করল, নিলচে, তুই আগে কখনো দিল্লি গেছিস?

—না!

—তুই জানিস, দিল্লিতে রাস্তা পার হওয়া কত শক্ত। এত গাড়ি চলে। তুই যদি চাপা পড়িস? তোর জন্যই আমাকে চিন্তায় থাকতে হবে।

তিন্নিদির এক বন্ধু অরিন্দম বললো, আজকাল যখন-তখন রেলে ডাকাতি হয়। তবু সঙ্গে একজন কেউ থাকলে—

রিংকু হেসে ফেলে বললো, আমার কম্পার্টমেন্টে যদি ডাকাতরা ওঠে, তা হলে নিলচে আমাকে সামলাবে?

এ কথা শুনে অন্যরাও হাসতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত রিংকুর জেদই বজায় রইলো। সে একাই দিল্লি যাবে।

তবে, হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যেতে তো কোনো বাধা নেই। আমরা পাঁচ-জন গিয়েছিলাম ওকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্য।

সকাল দশটা বেজে দশ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে। আমরা সাড়ে নটার মধ্যে পৌঁছে গিয়ে রিংকুর টিকিটের নম্বর খুঁজে সুটকেস তুলে দিয়েছি। তারপর গল্প করছি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, ঠিক দশটার সময় একটা বেশ বড় সুটকেস টানতে টানতে এসে হাজির হলো তিন্নিদি।

আমরা সবাই অবাক।

রিংকুর এই ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে তিন্নিদি বিশেষ কোনো কথাই বলেনি আগে।

আমাদের অগ্রাহ্য করে তিন্নিদি রিংকুর সামনে এসে বললো, আগে যদি বলতাম, আমি তোর সঙ্গে যাবো, তুই নিশ্চয়ই আপত্তি করতিস। এখন কী করবি? তোর ঠিক পাশের সিটটা আমার। যদি তুই আমার সঙ্গে যেতে না চাস, নেমে পড়। আমি এই ট্রেনে দিল্লি যাবোই!

আমরা ভাবলাম, এই রে, এই বোধ-হয় দুই বোন বিরাট ঝগড়া বাধিয়ে বসবে। অন্তত একটা কিছু নাটক হবেই।

রিংকু তিন্নিদিকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, দিদি, দিদি, তুই কেন আগে আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা বলিসনি? আমি তো শুধু তোর সঙ্গেই যেতে চাই। কিন্তু তুই একবারও আমাকে কিছু বলিসনি। কেন, কেন, কেন?

রিংকু এই সব বলতে বলতে কেঁদে ফেললো।

তা দেখে আমারও চোখে জল এসে গেল, এমন মধুর দৃশ্য দেখলে...

আমরা কোনো কথাই বলতে পারলাম না।

দু-এক সেকেন্ডের মধ্যেই বেজে উঠলো ট্রেন ছেড়ে দেবার হুইশ্‌ল। দুই বোন তাড়াতাড়ি কামরায় উঠে পড়ে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লো আমাদের দিকে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই আমি চেঁচিয়ে বললাম, গুড লাক!

রিংকুর সঙ্গে সেটাই আমার শেষ দেখা।

২

শোভনার কথা

চাকরির ইন্টারভিউয়ের চিঠি পাওয়া আর চাকরি পেয়ে যাওয়া তো এক নয়। আর কতজন এই চিঠি পেয়েছে, তাদের কার কী রকম যোগ্যতা তাও আমরা জানি না।

কিন্তু ক'দিন ধরে সবাই এমন ভাবে আলোচনা করছিল, যেন এর মধ্যেই রিংকু চাকরি পেয়ে গেছে। সে অনেক দূরে চলে যাবে।

আমি সব সময় যে-কোনো ব্যাপারে উল্টো দিকটাও ভাবি। সেটাই আমার স্বভাব।

আমি জানতাম, রিংকুকে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। হঠাৎ সে কোনো ছেলেকে বিয়ে করে ফেলতে পারে, কিংবা কোনো চাকরি পেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। ওর স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে সেই ছটফটানি। জোর করে তো তা শোধরানো যায় না।

রিংকু একা একা দিল্লিতে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে। এখনো অনেকেই ভাবে, মেয়েরা অবলা, কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়া তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। অনেক মেয়েই তো এখন একা একা বিদেশে চলে যাচ্ছে। এক ট্রেনে সরাসরি দিল্লি যাওয়াটা কী এমন ব্যাপার!

আমি ভাবছিলাম অন্য একটা কথা। চাকরিটা পেয়ে গেলে তো ভালোই হয়। কিন্তু ইন্টারভিউতে ওর চেয়ে যোগ্যতর প্রার্থী যদি আরও থাকে? যদি রিংকু চাকরিটা না পায়?

দিল্লিতে তখন রিংকুর মনের অবস্থা কী হবে? সে যে কোনো ব্যাপারে পরাজয় সহ্য করতে পারে না। এতদূর এসে কোনো লাভই হলো না, অন্য কোনো ক্যান্ডিডেটের কাছে হেরে গিয়ে, সেই অপমানিত মুখ নিয়ে তাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে, এই অবস্থাটা চিন্তা করতেই আমার ভয় হচ্ছিল। রিংকু যদি হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে? ঐ সময়টায় রিংকুর পাশে আমার থাকার দরকার। খুবই দরকার।

ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পর, রিংকু আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দিদি, তুই খাবার কিছু এনেছিস?

আমি বললাম, না তো। ট্রেনেই তো খাবার দেয়। দ্যাখ না, একটু পরেই কে কী খাবে, তা জিজ্ঞেস করার জন্য লোক আসবে।

রিংকু বললো, তা জানি। কিন্তু তুই কি সে খাবার খেতে পারবি? আমি সব রকমের খাবারই খেতে পারি, তোরই তো খাওয়ার ব্যাপারে খুঁতখুঁতুনি আছে।

আমি হেসে বললাম, আজ থেকে আমি খুঁতখুঁতুনি ত্যাগ করলাম। দেখিস, যা খাবার দেবে, তা-ই ঠিক খেয়ে নেব। তা ছাড়া আমি সঙ্গে দু-তিন রকম বিস্কিট এনেছি, তাতেও অনেকটা খিদে মিটে যায়।

রিংকু বললো, তুই ক'দিনের ছুটি নিয়েছিস? আমি তো ঠিক করে এসেছি, আরও সাত-আটদিন দিল্লিতে থেকে আসবো। কাজে জয়েন করার আগে ওরা নিশ্চয়ই কয়েকদিন সময় দেবে।

অর্থাৎ রিংকু ধরেই নিয়েছে যে ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে।

আমি বললাম, আমার অনেক ছুটি জমে আছে। তাই আমি তিন সপ্তাহের

জন্য ছুটি নিয়েছি। তুই তো এই প্রথম-বার দিল্লি যাচ্ছিস, আমি ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম বাবার সঙ্গে। তবু অনেক কিছুই দেখা হয়নি। এবারে কুতুব মিনারটা একবার দেখে আসবোই ঠিক করেছি। তাজমহলেও একবার যেতে পারি, আগ্রা তো খুব বেশি দূর নয়।

রিংকু খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাজমহল যেতেই হবে। আগ্রায় দু'তিন দিন থাকবো। ঐসব জায়গায় একা একা ঘোরার চেয়েও...তুই সঙ্গে থাকলে বেশ মজা হবে।

ব্যাগ খুলে রিংকু একটা চিউইংগামের প্যাকেট বার করলো। চিউইংগাম খাওয়াটা রিংকুর একটা নেশার মতন। আমি আবার ওটা পছন্দই করি না। তবু আজ মুখে দিলাম একটা।

রিংকুর সিটটা জানলার পাশে। তারপরে আমার, তারপর এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের। তিনি প্রথম থেকেই একটা মোটা হিন্দি বই পড়ে চলেছেন।

উল্টোদিকে এক বৃদ্ধা মহিলা, আর একটি রিংকুর বয়েসি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা দেওয়া, তার পাশে এক ভদ্রলোক চোখ বুজে আছে। ঘুমোচ্ছে না ঘুমের সাধনা করছে, তা বোঝা যায় না।

মাথায় ঘোমটা দেওয়া মেয়েটি ব্যাগ হাতড়ে ছোট্ট একটা কৌটো বার করলো। তার মধ্যে রয়েছে লবঙ্গ।

কৌটোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে নম্র গলায় বললো, নেবেন?

অর্থাৎ এই মেয়েটি বাঙালি। আগে বোঝা যাচ্ছিল না।

রিংকুও একটা লবঙ্গ তুলে নিয়ে বললো, তাহলে আপনিও একটা চিউইংগাম নিন।

মেয়েটি হেসে বললো, চিউইংগাম আর লবঙ্গ কি একসঙ্গে খাওয়া যায়? আমি পরে নেবো।

এরপর মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। ওর নাম আশালতা।

ওদের বাড়ি চন্দননগরে। পাশে চোখ বুঁজে থাকা লোকটা ওর কাকা। কাকার সঙ্গে সে দিল্লি যাচ্ছে একটা কাজে।

একটু পরেই আরো জানা গেল যে, সেও যাচ্ছে রিংকুর মতন একই চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে।

একই চাকরির জন্য দু'জন ক্যান্ডিডেট!

বিদেশি দূতাবাসের চাকরি, সেখানে মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া লাজুক ধরনের মেয়েটির তুলনায় রিংকুর যোগ্যতা অনেক বেশি। রিংকু স্মার্ট, ইংরেজি বলতে পারে ভালো। আশালতা চন্দননগরের মেয়ে, হয়তো ফরাসি ভাষাটা ভালোই শিখেছে। কিন্তু ইংরেজিতে বেশ দুর্বল, কথায় কথায় সে স্ট্রং উচ্চারণ করতে গিয়ে বললো, এস্‌স্ট্রং, আর সোসাইটিকে বললো, শোশাইটি...। সে একলা অতদূরে যেতে সাহস পায় না, তাই কাকাকে সঙ্গে এনেছে। বিবাহিত না কুমারী, তা বোঝা যাচ্ছে না। কুমারী মেয়েরা তো মাথায় ঘোমটা দেয় না।

রিংকু আর সে প্রতিযোগী। কিন্তু রিংকু এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন সে আশালতাকেই চাকরিটা পাইয়ে দিতে চায়।

দিল্লির মেল ট্রেন কয়েকটা মাত্র বড় বড় স্টেশনে থামে।

আবার এক এক দিন এমনও হয়, খুব ছোট্ট, নাম-না-জানা কোনো স্টেশানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। সিগনাল পায়নি, কিংবা অন্য কোনো কারণে। আজও সেরকম এক জায়গায় ট্রেনটা থেমে গেল। আমি উঁকি মেরে দেখলাম, সে স্টেশানের নাম কোতুলপুর, প্ল্যাটফর্মে মানুষজন নেইই প্রায় বলতে গেলে।

ট্রেনটা লেট করলেও আমাদের চিন্তার কিছু নেই। রিঙ্কুর ইন্টারভিউ পরশুদিন। যথেষ্ট সময় আছে।

একটু পরে রিংকু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দিদি, আমি টয়লেট থেকে ঘুরে আসছি।

আশালতার চোখ বুজে-থাকা কাকাটি এর মধ্যে চোখ খুলেছে আর অনেক কথা বলতে শুরু করেছে। সেও একটি কলেজে পড়ায়, তার প্রায় সব কথাই ছাত্র-রাজনীতি বিষয়ে। আমি ও ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না। তবু ঐসব শুনতেই হলো।

ট্রেনটা কতক্ষণ থেমেছিল ঠিক খেয়াল করিনি। এক সময় হুইশ্‌ল বাজিয়ে নড়াচড়া শুরু করলো। আশালতার কাকা তখন এক অধ্যাপিকার সঙ্গে একজন ছাত্রের প্রেম কাহিনি, বেশ রোমাঞ্চকর ভাবে শুনিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, রিংকু এখনও ফিরলো না কেন?

আমাদের বাড়িতে কেউ কোনো খারাপ কথা ব্যবহার করি না। যেমন টয়লেটে আমরা যে দুটি কর্মের জন্য যাই, তা আমরা বলি, ছোট বাথরুম আর বড় বাথরুম।

রিংকু কি বড় বাথরুমে গেল? তাও তো এতটা সময় লাগার কথা নয়। রিংকু বাথরুমে বেশি সময় কাটায় না কখনো।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর আমার মনটা ছটফটিয়ে উঠলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আশালতার কাকার গল্পটা মাঝপথে থামিয়ে বললাম, আমি একটু আসছি।

এই কামরায় দুটো টয়লেট। দুটোরই দরজা খোলা। ভেতরে কেউ নেই। তা হলে রিংকু গেল কোথায়?

এই কামরা থেকে পাশের একটা কামরায় যাওয়া যায়। সেখানে কি রিংকু কোনো চেনা মানুষের সন্ধান পেয়েছে?

সেই কামরায় চলে গিয়ে আমি একটুখানি দাঁড়ালাম।

রিংকু এখানে বসে থাকলে আমাকে দেখতে পাবে। নিশ্চয়ই উঠে আসবে।

কোথাও রিংকুকে দেখা গেল না। আমি ভেতরে ঢুকে প্রত্যেকটা সিটে চোখ বুলোলাম। রিংকু নেই।

তা হলে রিংকু কোথায় গেল?

ট্রেন এখন বেশ জোরে ছুটছে। এমন একটা ভয়ে আমার বুক কাঁপছে যে আমি আর অন্য কিছু না ভেবে ট্রেন থামাবার চেন টেনে দিলাম।

ট্রেনের গতি কমে এলো। একজন যাত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার বলুন তো।

আমি উদভ্রান্তের মতো বললাম, আমার বোনকে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনারা কেউ তাকে দেখেছেন?

এক মহিলা বললেন, আপনার

এখন সেখানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব

বোন, মাথায় কোঁকড়া চুল তো? খানিকক্ষণ আগে তাকে টয়লেটে যেতে দেখেছি।

সেখানে সে নেই।

ট্রেন একেবারে থেমে যাবার পর গার্ড ও আর একজন লোক উঠে এলো।

আমার তখন আর কথা বলার মতন অবস্থা নেই। কান্নায় গলা বুজে যাচ্ছে। শুধু বলছি, আমার বোন। আমার বোন।

গার্ড সাহেব বললেন, কেউ শুধু শুধু চেন টানলে, দু' থেকে পাঁচ হাজার টাকা ফাইন হতে পারে। আপনার বোন সত্যি এই ট্রেনে উঠেছিলেন তো? নাকি কলকাতা থেকেই ট্রেন মিস করেছেন?

তখন আশালতা আর তার কাকা একসঙ্গে বলে উঠলো, না, না, তিনি তো ঐ সিটটায় বসে ছিলেন, একবার উঠে গেলেন...

কে যেন জিজ্ঞেস করলো, আপনার বোনের কাছে মোবাইল ফোন নেই? আজকাল এই একটা খুব সুবিধে হয়েছে। কল করে দেখুন না!

রিংকু আমার চেয়ে অনেক বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, এমনকি রাত্তিরেও বালিশের পাশে নিয়ে শোয়। তবে রিংকু টয়লেটে যাবার সময় ফোনটা সঙ্গে নিয়ে যায়নি। সেটা ওর সিটের ওপর পড়ে আছে।

গার্ড বললেন, তা হলে তো এ কথাই মনে হয় যে, কোতুলপুরে যখন ট্রেনটা থেমেছিল, উনি প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক-ওদিক ঘুরছিলেন, ট্রেন ছাড়ার সময় হুইশ্‌ল শুনতে পাননি। অন্যমনস্ক ছিলেন, তাই আর উঠতে পারেননি।

এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হলো না। রিংকু মোটেই এমন আনস্মার্ট মেয়ে নয়। নীচে নামলেও আমাকে জানিয়ে দিত নিশ্চয়ই—

অন্য একজন যাত্রী হঠাৎ বলে উঠলো, আপনার বোন কি প্রজাপতি খুব ভালোবাসেন?

এ আবার কি অদ্ভুত কথা। প্রজাপতি দেখতে কে না ভালোবাসে। সে জন্য কেউ কি ট্রেন মিস করে?

লোকটি বললো, এ রকম হয় কিন্তু। একবার আসানসোলে এরকম একটা ঘটেছিল। একটা নতুন ধরনের প্রজাপতি দেখতে পেয়ে এক মহিলা সেটার ছবি তোলার জন্য বাইরে চলে গিয়েছিলেন, আর ট্রেনে উঠতে পারেননি।

রিংকুর ছবি তোলার শখ নেই। সঙ্গে ক্যামেরাও আনেনি।

আমি গার্ড সাহেবকে ব্যাকুল মিনতির সঙ্গে বললাম, তাহলে ট্রেনটা কোতুল-পুরে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। ও যদি কোনো কারণে ওখানে থাকে।

গার্ড সাহেব দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, সে নিয়ম নেই। কোতুলপুর আমরা ছেড়ে এসেছি পঁয়ত্রিশ মিনিট আগে, এখন সেখানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বরং পরের স্টেশানে আমরা কিছুক্ষণ থামবো, ওখান থেকে কোতুলপুরের স্টেশান মাস্টারকে খবর পাঠাবো। আপনিও সেখানে নেমে গিয়ে একটা গাড়ি-টাড়ি ভাড়া করে ওখানে চলে যান। নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে পাবেন। এমনি এমনি তো কেউ অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না!

আমি সেসব শুনতে না চেয়ে বারবার বলতে লাগলাম, চলুন, চলুন, ফিরে চলুন। এর জন্য বেশি পয়সা লাগলে আমি দিয়ে দেব।

গার্ড এবার কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার চাকরি চলে যাবে। আপনার সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ নেই?

আশালতা আমার হাত ধরে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বললো, দিদি, আপনি অত উতলা হবেন না। পরের স্টেশানে গেলে নিশ্চয়ই কিছু খবর পাওয়া যাবে।

কিছু যাত্রী রীতিমতন বিক্ষোভ দেখাবার সুরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, আর কতক্ষণ এই মাঠের মধ্যে থেমে থাকবে? আমাদেরও জরুরি কাজ আছে.....ইত্যাদি।

আবার ট্রেন ছেড়ে দিল। তার মধ্যে প্রত্যেকটি কামরা ও সব বাথরুম খুঁজে দেখা হলো। কোথাও রিংকুর চিহ্ন নেই।

পরের স্টেশানেও কোনো খবর আসেনি।

সেখানে রিংকু আর আমার মালপত্র নিয়ে নেমে যেতে হলো।

গাড়ি ভাড়া করে কোতুলপুর ফিরে যাওয়া অনেক খরচের ব্যাপার। আমাকে একা পেয়ে কোনো গাড়ির ড্রাইভার কী ব্যবহার করবে তাই বা কে জানে।

কয়েকজন যাত্রী পরামর্শ দিল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে নিশ্চয়ই কোনো

লোকাল ট্রেন পাওয়া যাবে কোতুলপুরের। সেটাতে যাওয়াই ভালো।

পরের স্টেশানে নেমে সেরকম লোকাল ট্রেন পাবার জন্য আমাকে সাড়ে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। সেই সময়টায় আমাকে কী যে উৎকণ্ঠা ও নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো, তা কারুকে বলে বোঝানো যাবে না। আমার মনের জোরও প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কোতুলপুরে লোকাল ট্রেনটি থামার সময় কিছু লোকজন দেখা গেল প্ল্যাটফর্মে। এরা কেউ আগে ছিল না।

কোনো লোকই রিংকু সম্পর্কে কোনো সন্ধানই দিতে পারলো না। স্টেশান মাস্টারও কিছু জানেন না।

আমি তাহলে এখন কী করবো? কোতুলপুরেই থেকে যাবো! নাকি চলে যাবো দিল্লি? অথবা ফিরে যাবো কলকাতায়? কিছুতেই মাথার ঠিক রাখতে পারছি না।

এই জন্যই মেয়েদের একজন পুরুষসঙ্গী লাগে?

বাবাকে এখনও কিছু খবর জানানো উচিত নয়। বাবাকে বাইরে থেকে দেখলে একজন শক্ত মানুষ মনে হয়, কিন্তু ভেতরে বেশ দুর্বল। আমার চেয়েও বাবা রিংকুকে বেশি ভালোবাসেন, তাও আমি জানি।

তা হলে কার কাছে সাহায্য চাইবো?

ঠিক কেন যে নীলাঞ্জনের নামটাই মনে এলো, তার কোনো ব্যাখ্যা আর দিতে পারবো না।

নীলাঞ্জন আমাদের কী যেন একটা আত্মীয় হয়। সঠিক সম্পর্কটা যে কী, তা আমার মনে নেই। তবে আজকাল কেউ ওসব সম্পর্ক গ্রাহ্য করে না। নীলাঞ্জনের সঙ্গে রিংকুরই বেশি ভাব।

রিংকুর মোবাইল ফোনে নীলাঞ্জনের নাম ও নাম্বার রয়েছে। একবারের চেষ্টাতেই পাওয়া গেল তাকে।

[illegible] সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাতেই [illegible] একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর [illegible] তিন্নিদি, তুমি কাঁদছো? আমি [illegible] যাচ্ছি হাওড়া স্টেশানে। কোতুল[illegible]রের প্রথম যে ট্রেন পাবো, তাতেই [illegible] আসছি। তুমি ঐ স্টেশানেই বসে [illegible] আর কোথাও যেও না।

বসে রইলাম প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে। কেউ আমার সম্পর্কে কোনো কৌতূহল দেখালো না। খানিক দূরে বসে আছে এক পাগলি, খুবই নোংরা চেহারা, মুখখানা ধুলোমাখা। সে মাঝে মাঝে বলে উঠছে, ঘোড়ার ডিম খাবি? আয় আয়, খাবি, খাবি?

নীলাঞ্জনের কথা

ফোনে তিন্নিদির গলার আওয়াজ শুনেই আমার মনে হয়েছিল, একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। এটা কোনো লুকোচুরির খেলা নয়।

রিংকু যদি কোনো কারণে ট্রেন থেকে নেমে ঘোরাঘুরি করে, আর ট্রেনে উঠতে না পারে, তাহলে সে কী করবে?

সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয় রিংকু। প্রথমেই সে খোঁজ করবে, আর কোন ট্রেনে দিল্লি পৌঁছোনো যায়। চাকরির ইন্টারভিউ সে মিস করবে না কিছুতেই।

আর তিন্নিদির কোতুলপুরে ফিরে এসে রিংকুর খোঁজ না পেলে তারও দিল্লি যাওয়া উচিত ছিল। তিন্নিদি যখন কোতুলপুরে আসছেন, ততক্ষণে রিংকুও উল্টো দিকের ট্রেনে দিল্লির দিকে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক ব্যাখ্যা।

আর রিংকুকে যদি কেউ বা কোনো দল অপহরণ করে থাকে, তবে তার পরিণতি হতে পারে অনেক রকম। আপাতত সে বিষয়ে চিন্তা না করাই ভালো।

দিন-দুপুরে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে? কেউ কিছু দেখলো না?

কোতুলপুরের নাম আমি আগে শুনিনি। কাল দুপুরের আগে সেখানে আমার পৌঁছানোর কোনো উপায়ই নেই। তিন্নিদিকে আমি ওখানেই বসে থাকতে বলেছি। তাহলে রাত্তিরটা তিন্নিদি কাটাবে কোথায়? রাত্তিরে স্টেশানে একা একা বসে থাকা খুবই বিপজ্জনক।

বেশ কিছু চেষ্টা করে আমি কোতুলপুর স্টেশানের ফোন নাম্বার সংগ্রহ করলাম। প্রথমবার স্টেশান মাস্টারকে পাওয়া গেল না, তিনি কোয়ার্টারে চলে গেছেন।

যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি জানালেন যে স্টেশান মাস্টারের নাম অতুল বারিক, একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কোয়ার্টারে থাকেন তাঁর স্ত্রী ও দুটি বাচ্চা। অর্থাৎ সংসারী লোক।

তৃতীয়বারের চেষ্টায় পাওয়া গেল তাঁকে।

প্রথমেই বললাম, নমস্কার অতুলবাবু, ভালো আছেন তো? আমি একটা বিষয়ে কিছু জানতে চাই, দয়া করে যদি একটু সাহায্য করেন।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, বলুন।

আমি বললাম, আপনার স্টেশানে দিন-দুপুরে একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। সে সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে ডিটেইলস্ জানতে চাই। আপনি দয়া করে বলবেন?

না।

আপনি কিছু বলবেন না?

না। আপনি কে? যার-তার সঙ্গে আমি কথা বলতে যাবো কেন?

আমি একজন সাধারণ মানুষ। আজকাল, ট্রানসপারেন্সি বা স্বচ্ছতা শব্দ দুটো খুব চলে। যে-কোনো সরকারি দফ্‌তর সম্পর্কে যে-কোনো সাধারণ মানুষেরও কিছু কিছু তথ্য জানার অধিকার আছে। তাই না?

আপনি কী জানতে চাইছেন, তাই তো আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো জানি, কোনো ঘটনাই ঘটেনি। আমি কিছু দেখিনি, জানিও না। যা ঘটেনি, তার আবার তথ্য কী?

কিছুই ঘটেনি বলছেন? দুপুরবেলা, যখন দিল্লি মেল সিগনাল না পেয়ে আপনাদের স্টেশানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সময়েই ঐ ট্রেনের এক মহিলা যাত্রী কী করে যেন উধাও হয়ে যায়। এটা সিরিয়াস ব্যাপার নয়?

সিগনাল না পেয়ে দিল্লি মেল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তা ঠিক। আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম। আমি নিজে কিছু দেখিনি, কেউ আমাকে কিছু জানায়নি। ট্রেনটা চালু হবার পর আমি কোয়ার্টারে চলে যাই। আপনি বানিয়ে বানিয়ে কী সব অভিযোগ করছেন, তা আমি বুঝতেই পারছি না।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম

একজন শিক্ষিত, যুবতী মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা একটা নির্মম সত্য। অনেক খোঁজাখুঁজি চলছে, আপনার কাছ থেকে যদি কোনো সাহায্য পাওয়া যায় তাই ভেবে অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি। আর একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে পারি?

বলুন।

যে মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার দিদি ঐ স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে একটা বেঞ্চের ওপর বসে আছেন। উনি খুবই ভয় পেয়েছেন। আমার সাহায্য চেয়েছেন। কিন্তু কলকাতা থেকে কোনো রকমেই কাল সকাল সাড়ে আটটার আগে ওখানে পৌঁছোতে পারছি না। তা হলে উনি যদি সারারাত ওখানে বসে থাকেন, তাতে ওঁরও কোনো বিপদ হতে পারে। তাই স্যার, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কোনো রকমে ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই রাত্তিরটা আপনার কোয়ার্টারে আশ্রয় দিতে পারেন না? আপনার স্ত্রী আছেন শুনেছি।

হ্যাঁ, আমার স্ত্রী আছেন, তিনি অসুস্থ। আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে আছে। তবে আমার এই অফিস ঘরটা খুলে রেখে যেতে পারি, উনি ইচ্ছে হলে এখানেই থেকে যেতে পারেন।

ওঁর মনের অবস্থা কী রকম, তা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন। আপনার স্টাফদের বলে যান, যাতে ওঁর সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করেন। যদি চা কিংবা কফি খেতে চান...

উনি আর কিছুই শুনলেন না, লাইন কেটে দিলেন। তবে ঐটুকু সাহায্যই যথেষ্ট।

এবার পুলিশ।

তিন্নিদি থানায় খবর দেননি, এফ আই আরও করেননি।

কোতুলপুর থানার ফোন নাম্বার জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়। ও সি'র নাম বিশ্বজিৎ হালদার।

তাকে নমস্কার জানিয়ে আমি নিজের পরিচয় দিলাম কলকাতার এক সাংবাদিক হিসেবে। দুই বোনের কাহিনি সংক্ষেপে জানিয়ে বললাম, ওঁদের একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো চিহ্নই নেই। আপনারা কোনো সন্ধান পেয়েছেন?

না। আমাদের কাছে কেউ কোনো রিপোর্ট করেনি।

আপনারা কি টেলিফোনে এফ আই আর নেন? তা হলে আমি...

সেটা সম্ভব নয়। আপনার আইডেনটিটি দেখা দরকার।

ঠিক আছে, আমি কাল সকালেই আপনাদের ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি। তখন সব কথা হবে। এখন আপনাদের কাছে শুধু একটাই অনুরোধ। যে-মেয়েটি হারিয়ে গেছে তার নাম রিংকু। তার দিদি, রেল স্টেশানে অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। আমি কাল সকালেই পৌঁছে যাবো। আজ রাত্তিরে তাকে যাতে কোনো বিপদের মধ্যে পড়তে না হয়, আপনি সেটা অন্তত দেখবেন?

আমরা রাত্তিরে দু'বার প্ল্যাটফর্মে টহল দিয়ে আসি। এখানে ক্রাইম-ট্রাইম তেমন ঘটে না। বেশির ভাগই গরিব মানুষ...

তিনি আর কথা বাড়াতে চান না। ফোন রেখে দিলেন।

যাক, তবু তো পুলিশকে জানিয়ে রাখা গেল।

রিংকুর কী হয়েছে, তার কিছুই জানা গেল না। এখন আমার বেশি চিন্তা তিন্নিদিকে নিয়ে। একা একা একটা নির্জন স্টেশানে বসে থাকা, তাঁর যাতে কোনো বিপদ না হয়...

রিংকুর ফোনটা তিন্নিদির কাছে। রিংকু সাধারণত ঐ ফোন রেখে কোথাও যায় না। টয়লেটে গেলেও ফোন সঙ্গে থাকে। অথচ রিংকু তার ফোন সিটের ওপর ফেলে রেখে প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াবে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

আমি তিন্নিদিকে ফোনে বুঝিয়ে বললাম, কেন আমি কাল সকালের আগে পৌঁছোতে পারছি না। তারপর বললাম, তুমি আর ঐ বেঞ্চে বসো না। স্টেশান মাস্টারের ঘরে চলে যাও। ঐ খানেই রাতটা কাটিয়ে দাও।

তিন্নিদি বললো, উনি আমায় বসতে দেবেন কেন? আমি একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমাকে পাত্তাই দিলেন না। আমাকে বললেন, কোনো হোটেলে চলে যেতে। এখানে সে রকম ভদ্রস্থ হোটেল নেই। যা আছে তাতে কোনো মেয়ে একা থাকতে পারে না।

আমি বললাম, স্টেশান মাস্টারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এখন তোমাকে বসতে দেবেন। একটু পরে

উনি যখন বেরিয়ে যাবেন, তখন তুমি দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দেবে। সারা রাত কেউ ধাক্কাধাক্কি করলেও খুলবে না।

রাত্তিরে আমি নিজেও ঘুমোতে পারিনি। আরও দু'বার কথা বলেছি তিন্নিদির সঙ্গে। ভোর হবার আগেই পৌঁছে গেছি হাওড়া স্টেশানে।

কোতুলপুরে নেমেই সোজা চলে গেলাম স্টেশান মাস্টারের ঘরে। দরজা খোলা কিন্তু সেখানে তিন্নিদি নেই।

একজন কর্মচারী বললো, ঐ মহিলা তো বেরিয়ে গেছেন একঘণ্টা আগে।

প্ল্যাটফর্মেও কোথাও তাকে দেখা গেল না।

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তাহলে কি তিন্নিদিও...

এটা অবশ্য অ্যালার্ম। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতন এদিক-ওদিক ঘুরছিলাম, মিনিট দশেকের মধ্যেই তিন্নিদির দেখা পাওয়া গেল। একটা লেডি'জ টয়লেটে গিয়েছিল। সারা মুখ কোঁচকানো, আমার কাছে বলতে লাগলো, কী নোংরা, কী নোংরা!

আমার মন বলছিল, এখানে রিংকুকে খোঁজাখুঁজি করে কোনো লাভ হবে না। আমাদের যেতে হবে দিল্লি। এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট পরে আসবে পরের ট্রেন।

ঐ সময়ের মধ্যে থানায় রিপোর্ট করে এলাম। কাছাকাছি কয়েক-জনকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কেউই রিংকুকে দেখেনি।

দিল্লিতে রিংকু কোন হোটেলে উঠবে, তা আমাকে বলেছিল। দিল্লি পৌঁছেই প্রথম সেই হোটেলে। না, রিংকু সেখানে আসেনি।

ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে রিংকুর এত উৎসাহ ছিল। আমরা চলে এলাম ক্যানাডার দূতাবাসে। ইন্টারভিউ শুরু হবে বেলা দেড়টা থেকে। ক্যান্ডিডেটরা এসে গেছে। প্রায় ১৪-১৫ জন। তাদের মধ্যে রিংকু নেই।

আমরা দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাইরের একটা পার্কে বসে। আশালতা নামের মেয়েটি দেখা করে গেল। ইন্টারভিউ চললো, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। রিংকু আসেনি। তিন্নিদি নিঃশব্দ, দু'চোখে শুধু জলের ধারা।

এরপর তিন-চারদিন সব সংবাদ-পত্রে আর টিভি চ্যানেলে এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো। একটি যুবতী মেয়ে, শিক্ষিত, সুস্থ, সে কী করে উধাও হয়ে যেতে পারে? কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। তার ডেডবডি পাওয়া যায়নি, তার জন্য কেউ মুক্তিমূল্য দাবি করে চিঠি লিখেনি, ফোনও করেনি।

চারদিন পরে কয়লাখনিতে ধস্ নেমে একুশ জন শ্রমিকের আটকে পড়ার মতন একটা বড় খবর এসে রিংকু উধাও রহস্যকে মুছে দিল সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে। এখন আমরা কী করবো? আমাদের সব খোঁজাখুঁজিই ব্যর্থ।

অনেকেরই ধারণা রিংকু আর বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে সে যে-কোনো উপায়ে তার দিদিকে কিংবা আমাকে একটা খবর দিতই। বাড়ির লোককে এতখানি দুশ্চিন্তায় ফেলে রাখা রিংকুর চরিত্রে একদম মানায় না।

আমি শুধু বলেছি, রিংকুর মৃত্যুর কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না। নির্দিষ্ট প্রমাণ চাই।

দেখতে দেখতে কেটে গেল চার মাস।

পরশুদিন তিন্নিদি আর একটা কাণ্ড ঘটালেন। রিংকুকে তিনি দেখতে পেয়েছেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তিন্নিদি কী একটা কাজে যাচ্ছিলেন বর্ধমান। ট্রেনে। বিকেলবেলা। মেমারি স্টেশানে ট্রেনটা থামতেই জানলা দিয়ে তিনি দেখলেন, কাছেই একটা বেঞ্চে বসে আছে রিংকু। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা, মাথার সব চুল খোলা, মুখে পাতলা হাসি।

তিন্নিদির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রিংকু তার হাসিটা আরও চওড়া করে, একটা হাত নেড়ে বলে উঠলো, দিদি, দিদি!

তিন্নিদি সেখানেই নেমে পড়ার জন্য দৌড়ে চলে এলেন দরজার কাছে! ট্রেনটা তখনো থেমে আছে।

তিন্নিদি কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নামবার আগেই রিংকু হাসতে হাসতেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে-কোনো ঘটনা বা কাহিনিতে অলৌকিকের ছোঁয়া থাকলে মানুষ বেশি আকৃষ্ট হয়। তিন্নিদি বানিয়ে বানিয়ে এরকম একটা মিথ্যে গল্প ছড়াবেন, তা একেবারে অসম্ভব। তিন্নিদির চরিত্রে এটা মানায় না। সুতরাং এটা সত্যি রিংকুর অতৃপ্ত আত্মা কয়েক মুহূর্তের জন্য দিদিকে দেখা দিয়ে গেল।

রিংকুর বাবা এতদিন এই বিশ্বাসটা আঁকড়ে ধরেছিলেন যে রিংকু বেঁচে আছে। কিন্তু এবার তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে পড়লেন নিজের ঘরে। ইস্কুলেও গেলেন না।

মুশকিলে পড়ে গেলাম আমি।

তিন্নিদিকে মিথ্যেবাদী হিসেবে আমি ভাবতেই পারি না। আবার তার গল্পটা মেনে নিলে এটাও মানতে হয় যে, রিংকু আর বেঁচে নেই।

একজন হারিয়ে যাওয়া জীবন্ত মানুষকে, এমনকি কোনো মৃত মানুষকেও হঠাৎ দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়। তার মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যাওয়া?

তিন্নিদিকে বললাম, ভালো করে ভেবে দেখো তো, রিংকু কী ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল, যে-বেঞ্চটায় বসে ছিল, সেখানে আর তাকে দেখা গেল না?

তিন্নিদি বললেন, না, তা নয়। দেখলাম, একটা কাচের তৈরি মূর্তি যেমন হঠাৎ ভেঙেচুরে যায়, সেই রকমই, আমার চোখের সামনে রিংকু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে, একটা ধোঁয়ার মতন মিলিয়ে গেল। আমি শুনেছি, মৃত আত্মা যখন শরীর ধারণ করে, বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, বিকেলবেলা, মেমারি স্টেশানে তখন অনেক লোক থাকার কথা। আর কেউ ওকে দেখেছে?

তিন্নিদি বললো, হ্যাঁ, লোকজন তো ছিলই। আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে পাগলের মতন কয়েকজন লোককে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এইখানে একটি সবুজ শাড়ি পরা মেয়ে বসেছিল। তাকে কেউ দেখেছেন? সে কোথায় গেল? সবাই বললো, তারা কিছু দেখেনি। আত্মা যখন

আমার মুখে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দিল

দেহ ধরে আসে, তখন সবাই তাকে দেখতে পায় না, শুধু একজনই দেখে। শুধু আমাকে দেখা দেওয়ার জন্যই ও এসেছিল।

আমি তিন্নিদিকে বলতে চাইলাম, (কিন্তু বলিনি) যে অন্য কেউ দেখতে পাবে না, সেটাই স্বাভাবিক। তুমি যদি একটা স্বপ্ন দেখো, সেটা আর কারুর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। তুমি রিংকুকে স্বপ্নে দেখেছো, হ্যাঁ, বিকেলবেলাতেই, তুমি রিংকুকে তৈরি করেছো। খুব তীব্র ভাবে কারুর কথা চিন্তা করলে, হঠাৎ কোনো সময় তাকে রক্ত-মাংসের চেহারাতেও দেখা যায়, আবার একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু কাচের মতন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিন্নিদি বললো, তুই-ও কি ভাবিস, এটা আমার চোখের ভুল? আমি তা কিছুতেই মানবো না। তোকে আমি এখন যেমন দেখছি, রিংকুও ঠিক সেই ভাবে, কাছে গেলে ছুঁতেও পারতাম। তা ছাড়া স্পষ্ট শুনেছি, রিংকু দু'বার দিদি, দিদি বলে ডাকলো। ও নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বলতে এসেছিল, সময় পেল না—

আমি তিন্নিদিকে আবার বলতে চাইলাম, (মুখে বলিনি অবশ্য) আত্মা বলে কিছু নেই। যত কিছু ও সম্পর্কে শোনা যায়, সবই গাল-গল্প। মানুষ যখন শেষ নিশ্বাস ফেলে, সেটাই ধ্রুব সত্যির মতন তার জীবনের শেষ। তারপর আর কিছু নেই। সেই মৃত মানুষের পক্ষে আবার শরীর ধারণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একেবারে অসম্ভব। সুতরাং ভূত-টুতের সব গল্পই মানুষের কল্পনা।

তিন্নিদির এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হলো নানা মহলে। রিংকুর মৃত্যুর কথা সবাই মেনে নিয়েছে। এখন দাবি উঠেছে, কী করে তার মৃত্যু হলো, তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখতে হবে। সি বি আইকে ভার দেবার কথাও বললো কেউ কেউ।

তিন্নিদি মেমারিতে একটা হোটেল ভাড়া করে রইলেন কয়েকদিন, যদি রিংকু আবার দেখা দেয়। বলাই বাহুল্য যে আর সেরকম কিছু ঘটেনি।

আমি রিংকুর মৃত্যুর কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না এখনো। কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো পাইনি।

রিংকুর কথা

দিল্লিতে যাবার জন্য কোনো পুরুষমানুষকে সঙ্গী হিসেবে নিতে হবে, এই চিন্তাটাই আমার অসহ্য লেগেছিল। মেয়েরা দূর দূর দেশে চাকরি করতে যাচ্ছে, আর দেশের মধ্যে ট্রেনে একলা যেতে পারবে না?

দিদিকে দেখে আমি খুশিই হয়েছিলাম। দিদি তো আমার পাহারাদার নয়। দু'জনে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

কিন্তু তা আর হলো না।

পুরুষদের দাপট, হিংসা, লাম্পট্য, জোর-জবরদস্তি এখনো চলছে। অনেক পুরুষই ভালোবাসতে জানে না, মেয়েদের সম্মান করতেও জানে না, শুধু গায়ের জোরে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে।

ওরা তিনজন কলকাতা থেকেই আমাদের অনুসরণ করছে। উঠেছে এই একই ট্রেনে। আমরা কিছুই জানি না, কিছু সন্দেহও করিনি।

টয়লেটে আর মানুষের কতক্ষণ সময় লাগে।

টয়লেট থেকে বেরিয়েই দেখি, দরজার কাছেই একছড়া হার পড়ে আছে। সোনার বলেই মনে হয়। অবশ্য আজকাল অনেক কস্টিউম জুয়েলারিও আসলের মতন মনে হয়।

হারটা আমি তুলে নিলাম। এটা কার জিনিস, কে ফেলে গেছে, তাকে ফেরত দেওয়া উচিত।

গেটের কাছে তিনজন পুরুষ দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার, বলতে পারেন?

আমার কথা যেন ওরা শুনতেই পেল না। একজন বলে উঠলো, ইস, ভদ্রমহিলা উঠতে পারেনি। দৌড়ে কি ধরতে পারবে?

এরকম কথা শুনলে কৌতূহল তো হতেই পারে। ট্রেনটা সদ্য ছেড়েছে। আমিও গেটের কাছে গিয়ে কোন মহিলা দৌড়োচ্ছে, তা দেখতে গিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে একজন আমার মুখে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দিল, যাতে আমি চ্যাঁচাতে না পারি। আর একজন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল দরজার বাইরে। নীচ থেকে আরও দু'জন আমাকে লুফে নিল, তারপর দৌড়ে চলে এলো প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আমাদের কামরার কেউ কিছু বুঝতেই পারলো না।

আমি নিজেকে ছাড়াবার জন্য যতই ছটফট করি, কিন্তু তিনজন পুরুষের সঙ্গে পারবো কী করে।

একটু দূরেই একটা রাস্তা, তার এক পাশে একটা বাঁশের ঝাড়। তার আড়ালে আমাকে ধরে রেখে ওরা কাকে যেন ফোন করলো। বোধহয় গাড়ি ডাকছে। ঠিক তাই, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে গেল একটা গাড়ি।

তার পেছনের দিকে আমাকে ফেলে রেখে, ওদের একজন পা দিয়ে চেপে রাখলো আমার শরীর।

তারপর সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, কী রে রিংকু, এবার তোকে কে বাঁচাবে?

অর্থাৎ সে আমাকে চেনে। তার গলার আওয়াজ অবশ্য চেনা লাগলো না।

প্রথমটায় আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। তারপরই মনে হলো, যে কোনো উপায়ে আমাকে বাঁচতেই হবে। নিজেই নিজেকে বাঁচাতে হবে। কে আর সাহায্য করবে?

কথা বলতে পারছি না, শুধু উঁ উঁ শব্দ করে যাচ্ছি। খবরের কাগজে এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখি, কয়েকজন বদমাশ লোক কোনো মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে সবাই মিলে রেপ করে, তারপর মেরে ফেলে, শরীরটাকে একেবারে থেঁৎলে দিয়ে ফেলে দেয় ঝোপেঝাড়ে।

এত যে কষ্ট করে লেখাপড়া শেখা, জীবন সম্পর্কে কত রকম স্বপ্ন, সব হঠাৎ শেষ হয়ে যায় গোটাকতক বর্বর পুরুষের লালসায়। গায়ের জোরে। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই।

মাথার মধ্যে এই চিন্তাটা দৌড়োদৌড়ি করছে আর আমি মনে মনে বলছি, আমাকে বাঁচতে হবে, বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে!

যে লোকটা আমার গায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছিল, সে কাকে যেন বললো, এই, ওর মুখের টেপটা খুলে দিয়ে হাত-দুটো বেঁধে ফ্যাল। তারপর উল্টে দে।

কথা বলার সুযোগ পেয়েই আমি বললাম, আমি পালাবার চেষ্টা করবো না, সত্যি বলছি, তাছাড়া, গাড়িটা খুব স্পিডে চলছে। আমার দিদি জোর করে আমাকে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিল, তোমরা আমাকে ধরে এনে খুব উপকার করেছো। ধন্যবাদ।

ওরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলো।

ড্রাইভারকে নিয়ে ওরা চারজন। যে-লোকটা আমাকে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল, তার মুখটা একটু যেন চেনাচেনা লাগলো। বোধহয় আমাদের বাড়ির সামনে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করেছে। ঐ লোকটাই এই দলের নেতা বলে মনে হলো।

এবার আমি উঠে বসলাম, কেউ আপত্তি করলো না।

আমি বেশ খুশি খুশি মুখ করে বললাম, তোমরা আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে তো? অনেক দূরে!

নেতাটি ঝুঁকে আমার গাল দুটো খুব শক্ত করে চেপে ধরে বললো, ন্যাকামি হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ অনেক দূরে, একেবারে যমের বাড়ি পাঠাবো তোকে।

আমি ওর হাতের ওপর একটা হাত রেখে বললাম, কী সুন্দর তোমার আঙুলগুলো। তুমি কি সেতার বাজাও?

এবার সে আমার গালে একটা জোরে চড় কষালো।

আমি আরও জোরে হেসে উঠে বললাম, হ্যাঁ, আমি একটু ন্যাকা আছি। আমার মা-ও তা বলে। মাঝে মাঝে আমাকে শাসন করবে। আমরা কখন শোবো? আমার খুব ইচ্ছে করছে।

ওরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলো।

আমি বাচ্চা মেয়ের মতন গলায় আরও ন্যাকামি এনে বললাম, তোমরা নাকি মেয়েদের ওপর জোর করো। যাকে বলে ধর্ষণ! কেন গো তোমরা এমন ভুল করো!

ওদের একজন বললো, চোপ। আর কোনো কথা শুনতে চাই না।

আমি তবু বললাম, জোর করলে আদ্ধেক আনন্দই তো মাটি। বেশ হাসি-গল্প হবে। একটুখানি নেশা, তারপর বিছানায় শুয়ে দু'জনেই সমান সমান ভাবে...তাতে যে কত বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। তোমাদের মধ্যে কে প্রথম শোবে? আমি তোমাদের চারজনের সঙ্গেই শুতে চাই এক এক করে। আগে প্রত্যেকেই একটা করে চুমু দাও...

কী করে আমি ঐ চারটে দুর্দান্ত প্রকৃতির, নিষ্ঠুর, বখাটে ছেলেকে ম্যানেজ করলাম, তা সহজে বলে বোঝানো যাবে না।

এ পর্যন্ত ওদের একজনও আমার সঙ্গে ঐ কাজটা করেনি, অথচ আমি প্রথম থেকেই রাজি ছিলাম। কে প্রথম করবে, তা কিছুতেই ঠিক করতে পারেনি। সে এক মজার ব্যাপার।

আরও একটা মজার ব্যাপার, ওদের নেতার নাম বাঘা, আমি তাকে বিয়ে করেছি। সেইদিনই নেপু বলে আর একজন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সে কথাও আমি বলে দিয়েছি বাঘাকে। আমি ওদের সঙ্গে রয়ে গেছি। প্রায় চার-পাঁচ মাস হয়ে গেল। মাঝে মাঝে আমি ওদের জন্য রান্না করে দিই।

গতকালই ঠিক হয়েছে, বাঘা মানে পলাশের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। অন্যরা তা মেনে নিয়েছে। আমারও ভালো লাগছে বেশ। এই ধরনের জীবন-যাপনের স্বাদ তো কখনো পাইনি।

বিয়ের খবর এখনও প্রকাশ্যে জানানো যাবে না। বাঘার নামে একটা ডাকাতির মামলার কেস আছে। বাঘা বলছে, ও অন্য জায়গায় দু'একটা ছোটখাটো ডাকাতির সঙ্গী ছিল ঠিকই, কিন্তু ঐ কেসটায় সে একেবারেই দোষী নয়। মামলা চলছে, রায় বেরোবার সময় যদি ওর নাম থেকে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়, তা হলে ও প্রকাশ্যে বেরুতে পারবে।

ওকে তখন বাবার কাছে, দিদির কাছেও নিয়ে যাবো। ও প্রণাম করে আসবে। বিচ্ছিরিভাবে মরে যাওয়ার চেয়ে এই জীবন অনেক, অনেক ভালো নয়?

ছবি : গৌতম দাশগুপ্ত